ভারতবর্ষের গণআন্দোলন ও যুবকদের কর্তব্য

১৯৭৫ সালের ২১ জুন, পশ্চিমবাংলার সিউড়িতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ইউথ অরগানাইজেশন আয়োজিত সারা বাংলা যুব সম্মেলনের প্রতিনিধি সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিশ্লেষণটি উপস্থাপিত করেন। এই ভাষণে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মেকি বিপ্লবী দলগুলির দ্বিচারিতা ও কংগ্রেসের সাথে তাদের গোপনে বোঝাপড়ার স্বরূপ উদঘাটন করেন। শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, সুনির্দিষ্টরূপে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে তার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের নিজস্ব বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া কত জরুরি, গুরুত্বের সাথে তা দেখানোর পাশাপাশি, এই সংগ্রামগুলিতে যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা কী হবে — তার উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

কমরেড ডেলিগেট্স,

আপনারা বাংলাদেশের যুবশক্তি। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সত্যিকারের জনস্বার্থে একটা সুসংগঠিত শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্যই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আপনারা এই যুব সম্মেলনে এসেছেন। এখানে কী অসুবিধা আপনারা ভোগ করছেন, আমি জানি। একে তো আট পার্টি ১ বিশে জুন বাংলা বন্‌ধ ডাকার জন্য আপনাদের মধ্যে অনেককেই বহু দূরদূরান্তর থেকে দু'তিন দিন ধরে অশেষ কষ্ট সহ্য করে একদিন আগে এখানে এসে পৌঁছুতে হয়েছে। তার ওপর উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবের জন্য, আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা দু'দিন ধরে কিছুই খেতে পাননি, ঘুমোনো দূরের কথা, একটু বিশ্রাম করার জায়গাও আপনাদের মেলেনি। তাছাড়া প্রবল বর্ষার জন্যও আপনাদের বহু কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। এ সবই আমি জানি।

তবু একটা কথা আমি আপনাদের বলতে চাই। তা হচ্ছে, বিপ্লবটা কি আরামে হয় নাকি ? বিপ্লবের মধ্যে মানুষকে কত দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে হয়, বর্ষায়, রৌদ্রতাপে কষ্ট সহ্য করতে হয়। বর্ষার জন্য, রৌদ্রতাপের জন্য কি বিপ্লব অপেক্ষা করে ? ভিয়েতনামের মানুষ জঙ্গলে বাঘের সাথে, সাপের সাথে থেকে বিপ্লব করেনি ? আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে — এ তো জানা কথা। কিন্তু, মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য কী ? পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জন্তু-জানোয়ার প্রকৃতির তাড়নায় ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। আর, মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক, বিপর্যয় হোক, হাজার অসুবিধার মধ্যেও বুদ্ধির দ্বারা স্থির মস্তিষ্কে কর্তব্য নির্ধারণ করে, তার দায়িত্ব পালন করে এবং কাজ করে।

এত বড় একটা সম্মেলন পশ্চিমবাংলায় ক'টা হয় ? হয়তো কংগ্রেস করে। কিন্তু, তারা করে পঞ্চাশ লক্ষ, ষাট লক্ষ, এক কোটি, দেড় কোটি টাকা খরচ করে। তারা স্যানিটারি পায়খানা বসিয়ে ক্যাম্প করে, ভাল বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে, এন্তার আলো-পাখার ব্যবস্থা করে। দুঃখ-কষ্টের কোন ব্যাপারই তাদের থাকে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা এটা করতে পারে। কিন্তু, গরিবের দল, মজুর-চাষীর দল, আমাদের সে সামর্থ্য কোথায় ? বিশেষ করে এমন ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যখন এত বড় একটা সম্মেলনে এত যুবক জড়ো হয়েছে, সেখানে অসুবিধা তো হতেই পারে। তার ওপর আপনারা শুনেছেন, শহরের প্রশাসনিক কর্তারা, সমস্ত রাজনৈতিক দল — কংগ্রেস থেকে শুরু করে এমনকী অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো পর্যন্ত — সহযোগিতা দূরের কথা, এই সম্মেলনে সব দিক থেকে বাধার সৃষ্টি করেছে। প্রতিনিধিদের একটা অংশের থাকবার জন্য যে বাড়ি নেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়িটি পর্যন্ত পুলিশের লোক গিয়ে শেষ মুহূর্তে তাদের দিতে হবে বলে বাড়িওয়ালাকে চাপ দিতে থাকে এবং তার ফলে সম্মেলনের ঠিক আগের দিন বিকেল বেলায় জানা গেল যে, ঐ বাড়ি পাওয়া যাবে না। আপনারা জানেন, স্কুল-কলেজ এখন সবই বন্ধ। কিন্তু, তা-ও সবই সি আর পি, পুলিশ দখল করে বসে রয়েছে। বর্ষার মধ্যে যেমন ধরনের একটা প্যান্ডেল তৈরি করতে পারলে আপনারা এত কষ্ট পেতেন না,

তেমন করার সামর্থ্য, টাকা-পয়সা নেই। ফলে, এটা শুধু স্থানীয় সংগঠকদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাও নয়। যে কোন জায়গার সংগঠকদের পক্ষে চেষ্টা করলেও — যেখানে পাঁচ থেকে সাত হাজারের মত বিপুল সংখ্যক ডেলিগেট এসে উপস্থিত হয়েছে, তার ওপর এই প্রবল বর্ষা এবং সমস্ত দিক থেকে এই ধরনের প্রতিকূলতা — সেখানে এর চাইতে বিশেষ কিছু ভাল বন্দোবস্ত করা সম্ভব হত না। তার ওপর আবার বাড়িও পাওয়া গেল না। ফলে, দুরবস্থা তো আপনাদের হতেই পারে। কষ্ট আপনাদের হয়েছে। কিন্তু, আমি দুঃখিত হয়েছি শুনে যে, হয়তো অনেকের দু'দিন খাওয়া হয়নি, দু'রাত্রি ঘুমোতে পারেননি — তার জন্য কিছু কিছু প্রতিনিধি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এ আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়েছে। (গলা ধরে আসে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করেন।)

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তার মধ্যে তিরিশটা বছর আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এদেশে একটা নতুন ধরনের দল, সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছি। বয়স আমার খুব বেশি হয়নি। কিন্তু, কর্মীদের তৈরি করার পিছনে, দলটা তৈরি করার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি ইতিমধ্যেই অসুস্থ। কিন্তু, সে তো এদেশে বিপ্লব গড়ে তোলার জন্যই। আমি লক্ষ্য করেছি, অসুবিধায় পড়লেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা খারাপ করে ফেলেন। অথচ, সকলে মিলেমিশে কষ্টের মধ্যেও শান্ত মেজাজে পরস্পরকে বুঝিয়ে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করতে পারি — এ জিনিস শুধু যে আমাদেরই ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং চরিত্র গড়ে তোলে তাই নয়, এ জনসাধারণকেও অনেক জিনিস শেখায়। এত কষ্ট, এত অসুবিধার মধ্যেও যতটুকু শৃঙ্খলা আপনারা দেখিয়েছেন, তাতে সিউড়ির মানুষ, বীরভূমের মানুষ একবাক্যে আপনাদের প্রশংসা করেছে। এমনকী পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যেও কথা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যেও এতখানি শৃঙ্খলা নেই। তবু যতটুকু অসন্তোষ আপনাদের মধ্যে দানা বেঁধেছে, তা আমায় অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছে।

আপনারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যায় ডেলিগেট এসেছেন। একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে অল্প কয়েকজন ডেলিগেট এসেছেন। আপনাদের ওপর পশ্চিমবাংলার আগামী দিনের সংগ্রাম অনেকখানি নির্ভর করে। আমি আপনাদের কাছে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক অবস্থা কী — বিভিন্ন দলগুলো কী করছে, কী চাইছে, আর আমরা কী করছি, কী চাইছি — সেটা আপনাদের সামনে রাখব। আশা করব, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যকে আপনারা ব্যর্থ হতে দেবেন না। আপনারা আপনাদের কাজ করবার জন্য, সংগ্রামের জন্য মূল রাজনৈতিক লাইন এবং ধারা — প্রচারের, কর্মের এবং সংগঠনের পদ্ধতি ও প্রোগ্রাম — এইসব এবং আপনাদের কর্তব্য-কর্ম বুঝে নিয়েই এ সম্মেলন থেকে ফিরে যাবেন। বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজে যাওয়ার জন্য আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। আবার বর্ষা এসে হয়তো আরও অসুবিধার মধ্যে আপনাদের ফেলবে। তবু আমি আশা করব, যাবার সময় একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আপনারা ফিরবেন যে, আপনাদের সামনে একটা যে চ্যালেঞ্জ এসেছে পশ্চিমবাংলায়, তার মোকাবিলা করার জন্য আপনারা সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

বাইরে আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতিতে অনেক পক্ষ দেখা গেলেও এবং কাগজগুলি অনেক পক্ষ দাঁড় করালেও, আমি মনে করি, মূল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিতে পক্ষ হচ্ছে মাত্র দু'টো — একটা বিপ্লব, আর একটা বিপ্লব-বিরোধিতা — সে যে নামেই হোক। কংগ্রেসের তরফ থেকেই হোক, তার রাজনীতির মাধ্যমেই হোক, বামপন্থার নানা ভেল্‌কি দেখিয়েই হোক, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের 'নারা' লাগিয়ে হোক বা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার নানা স্লোগান এবং চটকদার রাজনীতির নামেই হোক — একটা বিপ্লব-বিরোধিতার রাজনীতি, আর একটা বিপ্লব গড়ে তোলার রাজনীতি।

এই বিপ্লব-বিরোধিতার রাজনীতি সচেতনভাবে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, না বুঝে হোক ফ্যাসিবাদ নিয়ে আসার পথ প্রশস্ত করেছে — যেমন, ইটালিতে ও জার্মানিতে বুদ্ধিজীবীরা, ছাত্র-যুবরা আত্মবিস্মৃত হয়ে ফ্যাসিবাদ আনতে কার্যত সাহায্য করেছিল। তারা বুঝে ফ্যাসিবাদ আনেনি। হিটলারের মিথ্যা প্রগতিশীল স্লোগানে, তার জাতীয় সমাজতন্ত্রের ধাপ্পাবাজিতে, মুসোলিনির গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধোঁকাবাজিতে, জাতীয়করণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের ধোঁকাবাজিতে বিভ্রান্ত হয়ে বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র-যুব সম্প্রদায় সেখানে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করে বসল। 'মনোপলিস্ট'দের টাকার কাছে তারা নিজেদের বিবেক বিক্রি করে দিল। নাৎসি গুণ্ডাবাহিনীতে তারা দলে দলে নাম লেখাল। এতটুকু তাদের বিবেকে বাধল না। তাই দেখুন,

সমগ্র ইউরোপের মধ্যে যে জার্মানি ছিল একদিন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে, শ্রমিক আন্দোলনে সমস্ত দিক থেকে একটা ঐতিহ্যপূর্ণ শক্তিশালী জাতি, আজ নাৎসিবাদের পরিণতিতে সেই জার্মানি হতমান, দ্বিধাবিভক্ত। জগতে তার সেই গৌরব আর নেই। এই নাৎসিবাদ জার্মানির এবং দুনিয়ার কী ধ্বংসসাধন এবং ক্ষতিসাধন করে গেল — দুনিয়ার মানুষ যাকে একবাক্যে ধিক্কৃত করেছে, মানবতার চরম শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু ইটালিতে ও জার্মানিতে যখন এই ফ্যাসিবাদ এসেছিল, তখন কিন্তু সে এসেছিল প্রতারণার ছদ্মবেশে মায়াজাল বিস্তার করে। এসেছিল প্রগতি আর সমাজতন্ত্রের বিভ্রান্তিকর স্লোগানের আড়ালে।

ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সেই ফ্যাসিবাদ নিয়ে আসার চক্রান্ত চলছে। গত ২৪শে এপ্রিলের সভায় আমি একটা জিনিস বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম, যারা আমাদের দেশের বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে 'স্মল প্রোডাকশন' (ক্ষুদ্র উৎপাদন) এবং 'স্মল পিজ্যান্ট ফার্মিং' (ছোট ছোট খামার প্রথায় চাষবাস) পদ্ধতিকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে দেশের কৃষি সমস্যা এবং বেকার সমস্যার সমাধানের কথা বলছেন, তারা যে দল বা আদর্শেরই তক্‌মাধারী হোন না কেন, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদ গড়ে তুলতেই কার্যত সাহায্য করে চলেছেন। আর একটা জিনিস আমি সেদিনের সভায় দেখাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসভা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য আমি সেদিন তা পরিষ্কার করতে পারিনি। আমি সেদিন দেখাতে চেয়েছিলাম, গণআন্দোলনে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর 'স্ট্র্যাটেজি' (রণকৌশল) কী। কী কী কৌশল দিয়ে তারা নিজেদের দলের কর্মী এবং সমর্থকদের — যারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, তাদের বিভ্রান্ত করছে, জনতাকেও বিভ্রান্ত করছে এবং শেষপর্যন্ত বিপ্লবী গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তারা তাদের সমস্ত কার্যক্রমের দ্বারা শুধু ইলেকশন রাজনীতির আন্দোলনকেই শক্তিশালী করছে। তাদের এই রাজনীতি পুঁজিবাদকে কোনদিক থেকেই দুর্বল করতে পারে না এবং শেষপর্যন্ত বিপ্লবের শক্তিকেও জন্ম দিতে পারে না। যাকে আমরা জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বলি, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে তারা অক্ষম।

আমি জনতার এই রাজনৈতিক শক্তি বলতে গ্রামে গ্রামে ও শহরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণ ও যুবশক্তিকে নিয়ে তেমন ধরনের সচেতন সংগ্রামশীল কমিটি গড়ে তোলার কথা বলছি, যারা মাথা খাটিয়ে সমস্ত রকমের কাজ বিপ্লবী গণলাইনের ভিত্তিতে নিজেরাই সামাল দিতে পারে, ঝক্কি সামাল দিতে পারে। যারা জনতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে — দাপটে নয়, পুলিশের শক্তির সাহায্যেও নয়, গুন্ডামির সাহায্যেও নয় — করে স্বকীয় গুণ, ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাভাবনার দ্বারা, চরিত্রের দ্বারা, সংগঠন শক্তির দ্বারা। যারা সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে নিজেদের কাজ সামাল দিতে পারে — আমি তেমন ধরনের কার্যকরী, রাজনৈতিকভাবে সচেতন শক্তিশালী গণকমিটি গ্রামের স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত গড়ে তোলার কথা বলছি। কারণ, বিরুদ্ধ শক্তির দিক থেকে বাধাবিপত্তি কখন কীভাবে আসবে সব সময় জানা যায় না। অনেক বুদ্ধি থাকলে কিছু কিছু হয়তো ধরা যায়। কিন্তু, বিরাট জ্ঞানী হলেও সমস্ত 'অচানক' আক্রমণ ধরে ফেলা যায় না। এরূপ অবস্থার সামনে সব সময়ই বিপ্লবী আন্দোলনকে পড়তে হয়। তাই বিপ্লবী সংগঠকদের ব্যক্তিগতভাবে এবং কমিটিগতভাবে এইরকম উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা দরকার — যারা যে কোনও অবস্থার সামনে মাথা খারাপ করে, তর্কাতর্কি করে, গোলমাল করে কাজ নষ্ট করে দেয় না।

আমি আমাদের দলের মধ্যে উঁচু স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, যেটা এখানে আমি বলতে চাই। আমাদের দলের মধ্যে অন্য দলের মতো চালাকি নেই। আমরা খোলাখুলি আলোচনা করি। এখানে প্রদেশের কিছু কিছু নেতা উপস্থিত আছেন। আমি তাঁদের জন্য বলছি, সাধারণ কর্মীদের জন্য বলছি। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত জিনিস লক্ষ্য করেছি। আমি দেখেছি, এত বড় একটা কাজ সামাল দেওয়ার সময় অসুবিধা হলেই তাঁরা গোলমাল করে ফেলেন, কথা বাড়াতে থাকেন। নেতারা জানেন না যে, অসুবিধার মধ্যে কথা বাড়াতে নেই। তখন অশেষ ধৈর্য এবং শান্তভাব দরকার। একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা না বাড়িয়ে সেখানে কীভাবে কাজের দায়িত্ব দেওয়া-নেওয়া করতে হয়, তার কৌশল জানতে হয়, শিখতে হয়। সেখানে কাজ হচ্ছে না বলে এবং অসুবিধা হচ্ছে বলে নানান তর্কাতর্কি, আলাপ-আলোচনা যাঁরা করতে থাকেন, তাঁরা তাঁদের এই আচরণের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তাঁদের চরিত্র ঠিক থাকলেও, বিপ্লবের জন্য তাঁদের জীবন দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও, ঝড়-ঝাপটার মধ্য থেকে, হঠাৎ বিপদের মধ্য থেকে, জটিল পরিস্থিতির মধ্য থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করে, বাঁচিয়ে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত নেতৃত্ব দিতে তাঁরা পারবেন না।

ভাষা শিখতে হলে যেমন অ আ ক খ শিখতে হয়, তেমনি সর্বযুগে যারা সমাজ পরিবর্তন করেছে, বিপ্লব করেছে, তারা সকলে বিপ্লবী শাস্ত্রের একটি প্রথম পাঠ মুখস্থ করেছিল। সেই প্রথম পাঠটি হ'ল, বিপদ এবং অসুবিধা — বিরুদ্ধ শক্তি থেকে হোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে হোক, অজানিত শত্রুর থেকে হোক, অভাবিত কারণ থেকে হোক, স্বকীয় দুর্বলতা থেকে হোক — যদি তার মধ্যে পড়ে যান, তাহলে অসুবিধাকে তৎক্ষণাৎ কী করে সুবিধায় পর্যবসিত করতে হয় — ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি, 'টার্ন ইয়োর ডিফিকাল্‌টিজ ইনটু ইয়োর অ্যাডভানটেজ' (অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত কর) — সকলে মিলে সেই চেষ্টা করতে পারার নাম হ'ল বিপ্লবী শিক্ষা। অসুবিধা কেন হচ্ছে, তা নিয়ে সকলে মিলে গোলমাল করার নাম হ'ল বিপ্লবের কু-শিক্ষা — সু-শিক্ষা নয়। যা আপনার অসুবিধা — যে অসুবিধা আপনার কাছে কোনদিন দেখা দেয়নি, যেসব ঝামেলা কোনদিন সামাল দেননি, যে বিপদের সামনে কোনদিন পড়েননি — হঠাৎ করে যদি সেই অসুবিধা, সেই ঝামেলা, সেই বিপদের সামনে পড়ে যান, তাকে মোকাবিলা করে, সকলে মিলে তাকে সহ্য করে আয়ত্তের মধ্যে এনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে যদি কাজ করতে পারেন, তাহলে ক্ষমতা আপনাদের কতগুণ বেড়ে গেল, কত আপনারা শিখলেন — নিজেদের মনের ওপর, চরিত্রের ওপর, আচরণের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আপনাদের এল। এসব জিনিস আপনাদের আয়ত্ত করতে হবে। না হলে বিপ্লব তো শুধু মুখের কথায় হবে না।

সম্মেলনে যেসব অসুবিধা আপনাদের হচ্ছে, তা দূর করার ক্ষমতা সংগঠকদের সাধ্যের বাইরে। প্রথমত, উপায়ের অভাব ; দ্বিতীয়ত, পরিবেশ প্রতিকূল। চেষ্টা করলেও হয়তো আর এখন বেশি কিছু সংশোধন করা যাবে না। কিন্তু, তবু আপনারা এসেছেন মেলায় উৎসবে নয়। আপনারা এসেছেন একটা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে। সকল পার্টিগুলো, এমনকী তক্‌মা লাগানো বামপন্থীরা পর্যন্ত এস ইউ সি আই-কে বিচ্ছিন্ন করার একটা ষড়যন্ত্র করছে। তারা ভাবছে, একদিকে কংগ্রেস এবং সি পি আই ক্ষমতায় থেকে অত্যাচার তো করছেই, অন্যদিকে তারা সব একসঙ্গে মিলে এস ইউ সি আই-কে কোণঠাসা করবে। তারা চাইছে, এস ইউ সি আই তাদের ইলেকশন-সর্বস্ব দুষ্ট রাজনীতির কাছে, তাদের 'স্টান্ট'-এর রাজনীতির কাছে, তাদের উজির-নাজির হওয়ার রাজনীতির কাছে, তাদের রাজনৈতিক কর্মীদের সুবিধাবাদী ও কাপুরুষ বানানোর রাজনীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করুক। আমরা বামপন্থী দলগুলোর এহেন সম্মিলিত চাপের কাছে কোনমতেই নতি স্বীকার করতে পারি না। কারণ, আমরা দেখেছি, তাদের এই রাজনীতি কীভাবে শুধু তাদের দলের কর্মী ও সমর্থকদেরই নয়, গোটা বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীদের কাপুরুষ ও সুবিধাবাদী বানিয়েছে। নাহলে দেখুন, যেখানে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ আজ মনেপ্রাণে চাইছে যে, বামপন্থীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এখানে একটা কার্যকরী শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলুক, সেখানে তাদের এত সংগঠক, এত কর্মী, এত সমর্থক থাকতেও তারা বলছে, ছাত্রপরিষদ, যুব কংগ্রেসিদের দাপটের জন্য পশ্চিমবাংলায় নাকি কোন আন্দোলন হতে পারে না। কারণ, তাদের কর্মীরা নাকি কংগ্রেসি সন্ত্রাসে ঘর থেকে বেরোতে পারে না। এই যাদের মনোভাব, তারা বিপ্লব করবে ? দলের নেতারা কর্মীদের এইরকম কাপুরুষ তৈরি করছেন। বিপ্লব যারা করবে, তাদের তো প্রথম মন্ত্র শিখতে হয় যে, আমরা মরবার জন্য তৈরি হয়েছি। যেদিন বিপ্লবের মন্ত্র নিয়েছি, সেইদিনই মৃত্যুর টিকিট কেটেছি। আপনারা জুলিয়াস ফুচিকের কথা শুনেছেন। ফ্যাসিস্টরা যখন তাঁর ওপর অত্যাচার করছে, তাঁকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে, তখন তিনি বলছেন — ভয় দেখাচ্ছ কাকে ? জান কি যেদিন কমিউনিজমের, বিপ্লবের ঝাণ্ডাটা কাঁধে তুলে নিয়েছি, সেইদিনই মৃত্যুর টিকিটটা কেটে রেখেছি। তোমরা আমাকে মেরে ফেললেও আমার জায়গা আমি ছাড়ব না। আমার যা বলার আমি বলে যাব, যা করার তা করে যাব। কারণ, কাপুরুষরাই মারে। সাহসীরাই মরতে পারে। যারা সাহসী, তারা শক্তিশালী শত্রু এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে। আর, যারা কাপুরুষ, তারা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতা পিছনে থাকলে দুর্বল মানুষের ওপর বীরত্ব ফলায়।

অথচ এখানে দেখুন, সি পি আই (এম) — যে নিজে বিপ্লব করবে বলে প্রচার করে — দলের কর্মীদের গর্তে ঢুকিয়ে দিল, ছাত্র পরিষদের গুণ্ডারা বেরোতে দেয় না বলে। আর, অন্যদিকে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে গোপন বোঝাপড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তাদের রাজনীতি হচ্ছে, জয়প্রকাশজির সাথে তারা যাচ্ছে, এইটা ওপর ওপর দেখিয়ে ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের সাথে একটা বন্দোবস্ত করা। এই বন্দোবস্তটি তারা ৫ই জুন[২] মহামিছিলের মধ্য দিয়ে করে ফেলেছে। ২০শে জুন তারা যে ধর্মঘট ডেকেছিল,

তাদের ধর্মঘটের সেই প্রচার সিউড়িতে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের সাথে তাদের এই বন্দোবস্ত কতদূর এগিয়েছে। যে ছাত্র পরিষদের ভয়ে এতদিন তারা ঘর থেকে বেরোতে পারেনি, তারা সব এখন 'বন্‌ধ করতে হবে', 'বন্‌ধ করতে হবে' বলে একদিকে মিছিল করছে, অন্যদিকে তাদের পাশ দিয়েই ছাত্র পরিষদের ছেলেরা 'বন্‌ধ বন্ধ করতে হবে', 'বন্‌ধ বন্ধ করতে হবে' স্লোগান দিতে দিতে চলে যাচ্ছে এবং দু'দলই একে অপরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। কোথাও কোনও সংঘর্ষ হচ্ছে না। এগুলো কী প্রমাণ করে ? প্রমাণ করে, কংগ্রেস বিরোধিতাটা তাদের বাইরে লোকদেখানোর বিষয় — একটা ইলেকশন রাজনীতি মাত্র। কংগ্রেসের সাথে ভিতরে ভিতরে তারা একটা বোঝাপড়া করে চলেছে। এস ইউ সি আই এই রাজনীতির বিরুদ্ধে একটা জ্বলন্ত প্রতিবাদ এবং চ্যালেঞ্জ।

এই মিথ্যা লোকঠকানোর যে রাজনীতিটা এদেশে চলছে, তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যই আপনারা ডেলিগেট হয়ে এই সম্মেলনে এসেছেন। আজ পশ্চিমবাংলার মানুষকে এই রাজনীতিটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এবং তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। গ্রামে-শহরে সর্বত্র আলাপ-আলোচনার মারফত মানুষকে এমন করে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তাদের মনে কোনও সংশয় না থাকে। তারা যাতে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারে যে, এটা মিথ্যা কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি — একটা চালাকি, শুধু ইলেকশন রাজনীতির জন্য। আসলে ভিতরে ভিতরে ইন্দিরাজির সঙ্গে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের দোস্তির সম্পর্ক। বিপ্লবের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কাজেই বুঝতে পারছেন, অনেক দায়িত্ব আপনাদের।

আপনারা মনে রাখবেন, ভ্রান্ত রাজনীতি জনগণের যে শত্রুতা করে চলেছে, পুলিশ-মিলিটারির যত দাপটই থাকুক না কেন, তারাও এত বড় শত্রু নয়। ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, তা আপনারা জানেন। এই বিরাট ভারতবর্ষের তুলনায় ভিয়েতনাম কতটুকু ? জনশক্তির তুলনায়, শিল্পের অগ্রসরতার তুলনায়, ভিয়েতনাম পশ্চিমবাংলার থেকেও একটা ছোট দেশ। তার জনসংখ্যাও এত নয়। অথচ, সেই দেশটা আমেরিকার পুরো মিলিটারি শক্তিকে পিছু হঠিয়ে দিল। আর, এই যুদ্ধটা একটা মামুলি যুদ্ধ ছিল না। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট যা খরচ হয়েছে, ভিয়েতনামের বিপ্লবকে দমন করার জন্য, সেই দেশের চাষী-মজুর-যুবশক্তিকে মেরে ফেলার জন্য আমেরিকা তার থেকে অনেক বেশি খরচ করেছে। তার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। কিন্তু, পারল কি শেষপর্যন্ত ভিয়েতনামের জনসাধারণকে দমন করতে ? কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে আমেরিকাকেই ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে যেতে হল। — হ্যাঁ, তার জন্য ভিয়েতনামের চাষী-মজুর-ছাত্র-যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু, প্রাণ তো শুধু ভিয়েতনামবাসীরাই দেয়নি। হাজার হাজার আমেরিকান সৈন্যকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। সেই প্রাণদানের পর আমেরিকার জনগণের চেতনা ফিরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, তারা কী অপকর্ম করতে গিয়েছিল। তাই হেরে যাওয়ার পর কিসিঙ্গার° বলেছে, আমাদের সবই ছিল — জাহাজ ছিল, যুদ্ধ জাহাজ ছিল, 'নাপাম' বোমা ছিল, মিলিটারি ছিল, 'ফাইটার বম্বার' ছিল, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ছিল, চোর ছ্যাঁচোড় ছিল, গুণ্ডাবাহিনী ছিল, 'প্রস্টিটিউট' ছিল, মদ ছিল — কিন্তু, ছিল না জনসাধারণ, ছিল না ভিয়েতনামের মানুষের মতো মনোবল, তাদের মতো চরিত্র এবং লড়াই করবার দৃঢ়তা। তাই আমরা হেরে গেছি।

গোটা ভিয়েতনামকে আমেরিকা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছিল। আপনারা দু'দিন এই বৃষ্টি, এই না খেতে পাওয়া, না শুতে পারার অসুবিধা ভোগ করছেন — তাদের দাঁড়াবার কোনও জায়গা ছিল না। একদিকে আমেরিকা তাদের ওপর ক্রমাগত বোমা ফেলেছে, তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, অন্যদিকে যুদ্ধ করতে করতে হাতে হাতে কোদালের সাহায্যে — মেশিন যন্ত্রের সাহায্যে নয় — সমস্ত দেশটাকে খুঁড়ে ফেলে মাটির তলে আর একটা দেশ তারা খাড়া করে ফেলেছে। আত্মরক্ষা করতে করতে, যুদ্ধ করতে করতে, বারো-তেরো বছরের ছেলে-মেয়ে থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তাদের দেশে এই কাজ করেছে। তারা পিছিয়েছে নাকি ? তাই বিপ্লব তারা করে। কাপুরুষরা বিপ্লব করে না। অসুবিধা হলেই যারা অস্থির হয়ে পড়ে, তারাও করে না। এইসব জিনিস আপনাদের শিখতে হবে। এই সম্মেলন থেকে আপনারা নিজেদের দুর্বলতাগুলো ভাল করে বুঝে যান।

আমার অনুরোধ এই যে, কষ্ট আপনাদের যতই হোক, এখান থেকে আপনারা এক একটি তৈরি রাজনৈতিক সৈনিক হিসাবে ফিরে যাবেন — যাঁরা একা যে কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেন। আপনারা কোন কৈফিয়ত দেবেন না। আপনারা মনে রাখবেন, সচেতন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হতে হলে আপনাদের

এমন গুণ আয়ত্ত করা দরকার যে, যে কোন দায়দায়িত্ব আপনারা একা বহন করতে পারেন। না বলতে আপনাদের লজ্জা হয়, কৈফিয়ত দিতে লজ্জায় আপনাদের মাথা কাটা যায়, নিজের মর্যাদায় আঘাত লাগে। পারি না — এই কথা বলতে আপনাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যে কোন ঝড়-ঝাপটায় আপনারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন। অপরে যদি মাথা খারাপ করেও দেয়, তাহলেও তার মধ্যে আপনারা মাথা ঠিক রাখতে পারেন। না পারলে, কী করে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়, তার কলাকৌশল শিখবার জন্য আপনারা সব সময় চেষ্টা করেন। বিপ্লবী কর্মীর এই গুণ থাকা অতি অবশ্য দরকার।

আর, আপনাদের মনে রাখতে হবে, আপনাদের ওপর যে দায়দায়িত্ব বর্তাবে, তার জন্য গরিব পার্টির কাছে কিছু চাইবেন না। জনতার সাহায্য নেবেন। কোন সম্মেলনে যেতে হলে পয়সা লাগে, প্রতিনিধি ক্যাম্পে থাকতে হলে একটা ন্যূনতম খরচ লাগে। আপনারা গরিব ঘরের ছেলে, পয়সা আপনাদের নেই। পকেট থেকে আপনাদের কয়জন পয়সা দিতে পারে ? পার্টি আপনাদের সম্মেলনে যেতে বলে এবং তার জন্য পয়সা সংগ্রহ করতে বলে। আপনারা ঘুরে ফিরে পয়সা সংগ্রহ করতে পারলেন না বলে সম্মেলনে যেতে পারলেন না বা পার্টির কাজের জন্য যেখানে যখন যাওয়া দরকার সেখানে যেতে পারলেন না — এ যেন না হয়। আপনারা যার যার এলাকায় জনসাধারণের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করবেন। তার জন্য সম্মেলনে যেতে হবে বলে পাঁচজনকে নিয়ে কমিটি গঠন করবেন। কমিটি গঠন করে জনসাধারণ থেকে চাঁদা তুলবেন। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করবেন। এইভাবে পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের খরচ বাদে বাকিটা সম্মেলনের তহবিলে জমা দেবেন। কিন্তু, সম্মেলনে যেতে আপনাদের হবে। যদি পয়সা সংগ্রহ করতে না পারার জন্য বিনা টিকিটে যেতে হয় এবং তার জন্য জেলে যেতে হয়, তাহলে তা-ও যেতে হবে। একজন আদর্শে উদ্বুদ্ধ সৈনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য পয়সা নেই বলে, টিকিট কাটতে না পারার জন্য আপনি গাড়িতে উঠবেন না ? উঠবেন, জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই উঠবেন। রেলের কর্মচারিকে বলবেন, আপনি ফাঁকি দিতে চাননি, অনন্যোপায় হয়ে উঠেছেন। আপনাকে সম্মেলনে যেতেই হবে, তাই উঠেছেন। যদি না ছাড়ে, জেলে নিয়ে যেতে চায় — যাবেন। এই হবে আপনাদের মনোভাব। এইরকম হবে আপনাদের দৃঢ়চিত্ততা এবং দায়িত্বজ্ঞান। আর, এই সম্মেলন থেকে আপনারা বুঝে যান, আপনারা নিজেদের রাজনীতি কতটুকু বোঝেন। ঠিক মতো আপনাদের কথাগুলো আপনারা মানুষকে বোঝাতে পারেন কিনা, সেটা ভাল করে বুঝে নিন।

আপনারা দেখেছেন, আট পার্টি ২০শে জুন সারা বাংলা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আমরা এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধতা করিনি এবং এটা আমরা কাগজে বিবৃতি দিয়েও আগেই জানিয়ে দিয়েছি। কোথাও আমরা ধর্মঘটের বিরুদ্ধতা করিনি। শুধু আমরা তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম যে — ২০শে জুন আমাদের যুব সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন, যে কথা তাঁরাও অনেক আগে থেকেই জানতেন, সেইদিনে ধর্মঘট না ডেকে তাঁরা যেন তাঁদের ঘোষিত ধর্মঘটের তারিখ পিছিয়ে দেন — বিশেষ করে এই যুব সম্মেলন যখন আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু, তাঁরা আমাদের কোন অনুরোধ ও যুক্তিতেই কর্ণপাত করলেন না এবং ২০শে জুন-ই ধর্মঘটের তারিখ বহাল রাখলেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, থাকুক না তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ, কিন্তু, তার জন্য জেনেশুনে আমাদের সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য ২০শে জুন-ই তাঁরা ধর্মঘট ডাকলেন — এর কারণ কী? যে গঙ্গাপূজার কথা পশ্চিমবাংলার মানুষই ভাল করে জানে না, তাকে উপলক্ষ্য করে তাঁদের পূর্বঘোষিত ১৮ই জুন ধর্মঘটের তারিখ তাঁরা পিছিয়ে দিতে পারলেন। আর, পিছিয়ে দিয়ে ঠিক ২০শে জুন আমাদের সম্মেলনের দিনই তাঁরা ধর্মঘটটি ডাকলেন, যাতে আমাদের ডেলিগেটদের, লোকজনদের আসার পথে অফুরন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কারণ, ২০শে জুন ধর্মঘটের ডাক দেবার জন্য তাঁদের একদিন আগে এসে এখানে পৌঁছুতে হবে। আর, একদিন আগে এখানে আসতে হলে তারও একদিন আগে তাঁদের বাড়ি থেকে বেরোতে হবে। আবার, এমন সব এলাকা রয়েছে, যেখান থেকে আসতে হলে তারও আগের দিন ভোরের বেলা বেরোতে হবে। অথচ, আমাদের টাকা নেই, পয়সা নেই, খাওয়ার সমস্যা রয়েছে। তারপর ধর্মঘটে যানবাহন অচল হওয়ার জন্য সেইদিন প্রকাশ্য সম্মেলনে লোকজনের আসতে আরও অসুবিধা। আর, এই ধর্মঘটে আমি আগেই বুঝেছিলাম, পশ্চিমবাংলার অন্য কোথাও এই ধর্মঘট হোক, আর না হোক, অন্তত বীরভূম জেলায় এই ধর্মঘট করার জন্য সর্বরকমে কংগ্রেস এবং আট পার্টি — দু'পক্ষ থেকেই চেষ্টা করা হবে। কারণ, দু'পক্ষই এই যুব সম্মেলনের বিরোধিতা করবে। এখানে যদিও বাইরে আট পার্টি বলবে, ধর্মঘট হোক ;

আর কংগ্রেস বলবে, না, ধর্মঘট হবে না — কিন্তু, তলে তলে দু'পক্ষই চাইবে ধর্মঘট সিউড়িতে হোক, যাতে আমাদের যুব সম্মেলনটি মার যায়। বাস্তবে হয়েছেও তাই। তার ওপর এই ঘোর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু, কী হয়েছে ? কোনদিন সিউড়ি শহরে এত বড় জমায়েত হয়েছে ? অথচ, এত প্রতিকূলতা এবং বিরুদ্ধ তার মধ্যে, এই ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই এই জমায়েত এখানে হয়েছে।

এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বহরমপুরে আমাদের দলের চাষী সংগঠন কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের[৪] সম্মেলনে গিয়েছিলেন। তাঁরা দেখেছেন, সেখানেও কত বড় জমায়েত হয়েছিল। বহরমপুরের মানুষ বলেছে, অত বড় জমায়েত এর আগে বহরমপুরে আর কখনও হয়নি। তার আগের বছর বাঁকুড়ায় কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের সম্মেলনে যে জনসমাবেশ হয়েছিল, বাঁকুড়ার মানুষ বলেছে — বাঁকুড়ায় তার আগে অত বড় জমায়েত আর হয়নি। অনেকে সেই সব জমায়েত নিজের চোখে দেখেছেন। অথচ, খবরের কাগজে তার সংবাদ কতটুকু দিয়েছে ? অত বড় জমায়েতের কোন পাব্‌লিসিটি খবরের কাগজ দেয়নি। এ বছর ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে কী বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। কোনও মানুষের হিসাব ছিল না কত লোক হয়েছে। কেউ জনসংখ্যা দু'লক্ষের কম বলেনি। কেউ কেউ পাঁচ লক্ষও বলেছে। সেদিন ময়দান বলে কিছু ছিল না। ময়দান, রাস্তা ভর্তি হয়ে গিয়ে একদিকে গ্র্যান্ড হোটেল, অন্য দিকে কার্জন পার্ক লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। অথচ, অত বড় বিশাল মিটিং-এর একটা 'পাব্‌লিসিটি' কোন পত্রিকা দেয়নি। আর, জ্যোতিবাবু দু'হাজার, তিন হাজার লোকের মিটিং করলেও কাগজগুলো কী পাব্‌লিসিটি দেয় ! এমনকী যে আর এস পি, যার তেমন সংগঠন নেই, তারও চোদ্দটা বিবৃতি খবরের কাগজ ছাপে, তার পাঁচশ লোকের মিটিং-এরও কত বড় পাব্‌লিসিটি খবরের কাগজ দেয়। ফরোয়ার্ড ব্লকের দেয়। প্রফুল্ল সেনের দেয়। সকলের দেয়। শুধু কি কংগ্রেসেরই পাব্‌লিসিটি দেয় নাকি ? কিন্তু, এস ইউ সি আই বিরাট সমাবেশ করলেও কাগজপত্রে তা বিশেষ গুরুত্ব পায় না। এগুলো কী প্রমাণ করে ? প্রমাণ করে, সকলে মনে করছে, বিনা পাব্‌লিসিটিতে এই পার্টিটা গড়ে উঠেছে, এত বড় হয়ে গেল — এর পর যদি আবার এর মিটিং-মিছিলের পাব্‌লিসিটি দেওয়া হয়, বা এর নেতাদের বক্তৃতা ছাপানো হয়, তাহলে এই পার্টির ক্ষমতা তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তারা রুখতে পারবে না। ফলে, কাগজের পক্ষ থেকে আমাদের দলের পাব্‌লিসিটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বন্ধ করা হচ্ছে।

জয়প্রকাশজি গতকাল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাউরকেলায় আমাদের এত বড় মিটিং হয়ে গেল, ২৪শে এপ্রিলের মিটিং-এর ছবি আমাদের কাগজ 'প্রোলেটারিয়ান এরা'তে দেখেছেন — বিশাল সমাবেশ, অথচ, কোনও কাগজ তার যথার্থ খবর দিল না — এরকম কেন হচ্ছে ? আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনাকে আমার বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। আপনি বুদ্ধিমান, নিজেই বুঝে নিন। ভারতবর্ষের নামী নামী নেতারা — কাগজ যাঁদের নেতা তৈরি করেছে — তাঁরা এর শতাংশের একাংশ মিটিং করলেও কাগজগুলো বিরাট পাব্‌লিসিটি দিত। এর উদ্দেশ্য আছে। কারণ, তারা চাইছে, এইসব নেতারাই আগডুম-বাগডুম গরম গরম কিছু কথা বলে মানুষকে বিপ্লবের রাস্তা থেকে যদি আটকে রাখতে পারে — যেমন ট্রেড ইউনিয়নের জালিয়াত নেতারা করে। তারা মজুরদের সত্যিকারের বিপ্লবের রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখার জন্য মজুরদের মিটিংয়ে মালিককে জোচ্চোর, বেইমান, এমনকী দরকার হলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি পর্যন্ত করে — তার বাপান্ত করে, শ্রাদ্ধ করে। আর, মজুররা তাই শুনে ক্রমাগত হাততালি দেয়। আর মনে করে, বাপরে বাপ, এই নেতা কত বড় — মালিকের এত বড় শত্রু আর নেই ! আর, মালিক এইসব শুনে তাকে গালাগালি করার জন্য সেই নেতাকে যদি কিছু বলতে যায়, তখন নেতা অতি সহজেই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, মালিককে গালাগালি না করলে মজুররা তার সাথে থাকবে কেন — এটা তো আর মালিকের বিরুদ্ধে যথার্থ গালাগালি নয়, মজুরদের ধরে রাখবার একটা কৌশল মাত্র। না হলে মজুররা তো সব বিপ্লবী পার্টির দিকে চলে যাবে, তাতে তো মালিকেরই ক্ষতি। নেতার এই চালাকিতে মালিকও খুশি হন এবং নেতাও হেসে হেসে তার চালাকির মূল্য বাবদ মালিকের কাছ থেকে পাওনার ওপর বাড়তি টাকা বুঝে নিয়ে চলে যায়। আমাদের দেশের বামপন্থীরা হচ্ছেন, সেই কায়দার নেতা। বাইরে তাঁরা ঘোর কংগ্রেস বিরোধী। তলে তলে সেই কংগ্রেসের সাথেই তাঁদের বোঝাপড়া। তাঁরা ভিতরে ভিতরে ইন্দিরাজিকে বোঝান যে, বাইরে তাঁর বিরুদ্ধে না বললে এবং তাঁর প্রশংসা করলে তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বেন কী করে ? কিন্তু কেন্দ্রে ইন্দিরাজি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেবার ষড়যন্ত্র হলে, যেমন '৬৯ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার সময় তাঁরা

ইন্দিরাজির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি আবার দাঁড়াবেন। এঁরাই নাকি আবার বিপ্লব করবেন !

কিন্তু, আপনারা মনে রাখবেন, তাঁরা ভুল হোন, ভ্রান্ত হোন, আজও মানুষের ওপর তাঁরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছেন। সবচেয়ে বিপজ্জনক হ'ল, তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে একদিকে সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্ব ও সি পি আই-এর সাথে, অন্যদিকে কংগ্রেসের সাথে ভিতরে ভিতরে একটা বোঝাপড়ায় এগোচ্ছেন। বাইরে কংগ্রেসবিরোধী গরম গরম প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, তাঁদের দলের কর্মীরাও তা ধরতে পারছে না। এইসব রাজনীতির নানান দিক এই প্রতিনিধি সম্মেলন থেকে আপনাদের বুঝে যেতে হবে। আপনাদের বুঝে নিতে হবে, তাঁরা জয়প্রকাশজির সাথে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে সামিল না হলেও, 'ইস্যু'র ভিত্তিতে জয়প্রকাশজির সাথে থাকতে চাইছেন কেন ? যে সংগঠন কংগ্রেস আছে বলে তাঁরা বিহার আন্দোলনে সামিল হলেন না, সেই তাঁরাই কেন আবার এখানে প্রফুল্লবাবুর সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে — যাঁর বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার মানুষ কী না বলেছে — গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সম্মেলন, মিছিল ইত্যাদি করছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে যদি একটা আন্দোলনও করতে হয়, জনসাধারণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে যদি গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ফিরিয়ে আনতে হয়, সেই আন্দোলনের শক্তি কি পশ্চিমবাংলায় প্রফুল্লবাবুরা ? না জনসংঘ ? যথার্থই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে যদি তাঁরা চান — তার জন্যই তো তাঁদের কাছে আমরা বার বার প্রস্তাব করেছি — একটা কার্যকরী আন্দোলন শুরু করুন। তাঁরা বলছেন, আন্দোলনের পরিবেশ নেই। কারণ, কংগ্রেস এমন গুন্ডামি করছে যে, তাঁদের কর্মীরা বেরোতে চায় না। তাঁদের বেরোবার পরিস্থিতি নেই। তাঁদের এ কথার যা মানে দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, আগে পরিস্থিতি তৈরি হোক, অর্থাৎ, কংগ্রেস তাঁদের. গায়ে হাত দেবে না, পুলিশ তাঁদের ধরবে না — তখন তাঁরা লড়াই শুরু করবেন। তার আগে, তাঁদের কথানুযায়ী, পশ্চিমবাংলায় লড়াই কী করে হবে ? এখন মিটিং- মিছিল — এসব হতে পারে। কাজেই পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন হচ্ছে না। আর, এখন কংগ্রেসের সাথে তাঁদের ভিতরে ভিতরে বন্দোবস্ত হয়ে আসছে — তাই বীরেরা আবার রাস্তায় নামছেন এবং 'বাঁচতে গেলে লড়তে হবে, লড়াই করে বাঁচতে হবে' স্লোগান দিচ্ছেন। কারণ, কংগ্রেসের সাথে ভিতরে ভিতরে বন্দোবস্ত এগোচ্ছে। কংগ্রেসের যেসব দুর্ধর্ষ শক্তিমান বীরপুরুষদের জন্য তাঁরা এতদিন ভয় পাচ্ছিলেন, কিছু করছিলেন না — এখন তাঁরা মিছিল করছেন। আর, কংগ্রেসের সেইসব বীরপুরুষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, কিছুই বলছেন না। আমার বক্তব্য এ নয় যে —তাঁরা বলুন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, কংগ্রেস বললেও আগে তাঁরা বেরোননি কেন ? আর, আজ তাঁরা বেরোচ্ছেন, কংগ্রেসই বা তাঁদের কিছু বলছে না কেন ? অথচ, কাগজপত্রে, বক্তৃতায় দু'পক্ষই দু'পক্ষের বিরুদ্ধে খুব সমালোচনা করছেন। এ তো নকল যুদ্ধ — যেমন পুলিশ-মিলিটারির মধ্যে ট্রেনিংয়ের সময় হয়ে থাকে — যা আসল লড়াই নয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণের পশ্চিমবাংলায় আগে যাই নাম এবং প্রভাব থাকুক না কেন, ঘটনাচক্রে বিহার আন্দোলন, গুজরাট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পত্রপত্রিকা মারফত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নিজের ভূমিকা ইত্যাদি মিলিয়ে ভারতীয় জনমানসের সামনে, যে করেই হোক, তিনি এসে গেছেন। তাঁর সম্বন্ধে যার যা-ই রাজনৈতিক বক্তব্য থাকুক, তিনি একটা জিনিস গড়ে তোলবার জন্য স্লোগান তুলছেন। তা হ'ল, জনশক্তির অভ্যুত্থান হোক, যুবশক্তি এবং ছাত্রশক্তির নৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার ওপর অভ্যুত্থান হোক। অর্থাৎ, জনআন্দোলন হোক। তার জন্য তিনি সংগ্রাম কমিটি তৈরি করার কথা বলছেন। তা নাহলে এদেশে পরিবর্তন আনা যাবে না। যদিও পরিবর্তন সম্বন্ধে, বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত বক্তব্যই ধোঁয়াটে। তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য কী, আমি খোলাখুলি তাঁকে বলে দিয়েছি। কাল মিটিংয়েও বলেছি। আমার বইও তিনি পড়ছেন, সেটাও তিনি গতকালের মিটিংয়ে বললেন। আমি পাটনাতেও তাঁকে বলেছি, জনগণের আন্দোলন নিচের স্তর থেকে ওপরের স্তর পর্যন্ত গণকমিটি গঠন করে গড়ে তুলতে হবে — এই জায়গাটায় আমি তাঁর সাথে একমত। তারপর তা শান্তিপূর্ণ পথে হবে, না সর্বাত্মক বিপ্লবের পথে হবে, নাকি, তা সশস্ত্র পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ নেবে — যা ভারতবর্ষের মুক্তির পথ হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে বলে আমরা বলছি — তার মীমাংসা লড়াইয়ের ময়দানে জনগণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে করে নেব। কিন্তু, তাঁর সাথে আমাদের এই জায়গাটায় ঐকমত্য যে, তিনি জনশক্তির অভ্যুত্থান চাইছেন। আমরাও চাইছি, এই কংগ্রেসবিরোধী নকল যুদ্ধের বাইরে গ্রাম স্তর থেকে শুরু করে জনতার নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার গণকমিটিগুলি গড়ে উঠুক। পার্টিগুলির যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে তার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রভাব

বিস্তার করে সেগুলোকে পরিচালিত করুক।

আর, এখন হচ্ছে কী ? ওপরতলায় বিভিন্ন পার্টিগুলিকে নিয়ে একটা কমিটি হচ্ছে, যেখানে এমন সব পার্টি আছে যাদের কোন ক্ষমতা নেই — যেমন ওয়ার্কার্স পার্টি, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর সি পি আই, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস। এরা সব এক একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে সি পি আই (এম)-এর পেছনে হাত তুলে বসে আছে। কমিটিতে ভোটে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হলে তাদেরও একটা করে ভোট হবে। অথচ, কারোর কোনও সংগঠন নেই। ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি — এদের কিছু সংগঠন আছে, কিন্তু, তেমন একটা ব্যাপক সংগঠন নেই। এগুলো সব সি পি আই (এম)-এর পেছনে থাকবে। তাঁরা ওপরে বসে সব ঠিক করে দেবেন, জনগণের এতে কোনও ভূমিকা নেই। কখন লড়াই হবে, সেটা তাঁরা ঠিক করবেন। কখন লড়াই তুলে নেওয়া হবে, সেটাও তাঁরাই ঠিক করবেন। লড়াইটা কী হবে, তা-ও তাঁরাই ঠিক করবেন। কিন্তু, জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার তাঁরা গড়তে দেবেন না। ..... (টেপ পাল্টাবার জন্য বক্তৃতার কিছু অংশ এখানে বাদ গেছে)।

.... তাই আজ অসংখ্য যুবকর্মী প্রয়োজন — যারা নির্দেশ পেলে কী অসুবিধা, খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে কি না, থাকার জায়গা আছে কি না — এসব প্রশ্ন না করে, বামপন্থার নামে যে ইলেকশন সর্বস্ব এবং চালাকি ও লোকঠকানোর রাজনীতি এখানে চলছে, তার বিরুদ্ধে একটা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। যেমন, ক্ষুদিরাম করেছিল চৌদ্দ বছর বয়সে। বাড়ি থেকে দেশের কাজে যখন সে চলে এসেছিল, তখন কি সে ভেবেছিল, কোথায় থাকবে, কি খাবে ? পুলিশ তাকে তাড়া করেছে। কিন্তু সে তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল। এইভাবে প্রত্যেকটি যুবকর্মী এই সম্মেলন থেকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেবেন। বুঝে নেবেন, কেন ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ধাঁচা না পাল্টালে জনগণের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। আর, আপনাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এই ধাঁচাটি পাল্টাতে গেলে গ্রাম লেভেল থেকে শহর লেভেল পর্যন্ত জনগণকে সংগঠিত করে গণসংগ্রাম কমিটিগুলো আপনাদের গড়ে তুলতে হবে — যে গণকমিটিগুলিকে শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে মোকাবিলা করতে হবে। এখন যে মিটিং-মিছিল চলছে — এই মামুলি মিটিং-মিছিলের গণতান্ত্রিক পথে হয়তো আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চলতে হবে। অবস্থা বিশেষে সত্যাগ্রহও করতে হবে এবং ধরনাও দিতে হবে। কিন্তু, এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসবের মধ্য দিয়ে জনতার সেইরকম সংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তোলা — যে কমিটিগুলি স্থানীয় ক্ষেত্রে হলে স্থানীয় ক্ষেত্রে, জেলা কমিটি হলে জেলা ক্ষেত্রে, প্রাদেশিক কমিটি হলে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে, সমস্ত জায়গার মানুষকে সংগঠিত করে একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মত, আর্মির মত কাজ চালাতে পারে। এর প্রত্যেকটি কর্মী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক একজন সৈনিকের মতো আচরণ করবে। এই আর্মি — 'মার্সিনারি আর্মি'র মতো পয়সা দিয়ে কেনা সৈনিক নয় — যাকে জনতার মুক্তি বাহিনী বা রেড আর্মি, বা শ্রমিকদের আর্মি বলে, এ হচ্ছে তাই। তেমনভাবে এই আর্মি গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু, এ ধরনের কর্মী বাহিনী একদিনে গড়ে উঠবে না, আর বাজে লোক দিয়েও হবে না।

তাই আমি বলেছিলাম, অল্প লোক দিয়ে শুরু কর। এটাই তো মন্ত্র ছিল, যেদিন আমি এই পার্টিটা শুরু করি অল্প কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে। সেদিন সকলে হেসেছে। সি পি আই তখন সম্মিলিত একটা পার্টি, আমাদের দেখিয়ে বিদ্রূপ করেছে। বলেছে, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। বলেছে, চামচিকাও পাখি, আর এস ইউ সি আই-ও পার্টি — এদের সঙ্গেও বসতে হবে। ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই — সকলেই বলেছে, আমাদেরটা নাকি একটা পার্টিই নয়, একটা ক্লাব। আমাদের সঙ্গে নাকি বসাই যায় না। এ সবই আমি চুপ করে সহ্য করেছি। তাদের কোন বিদ্রূপই গায়ে মাখিনি। শুধু দলটা গড়ে তোলার জন্য একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়েছি। তার ফল কী হয়েছে ? আজ ঐসব পার্টিগুলো কোথায় পড়ে আছে ? সি পি আই (এম), কংগ্রেসের থেকেও আজ প্রধান শত্রু মনে করে এস ইউ সি আই-কে। কারণ, সে মনে করে, এই এস ইউ সি আই-ই তার চালাকির রাজনীতির কবর খুঁড়ে দেবে। এস ইউ সি আই শুধু কংগ্রেসের নয়, বামপন্থার আলখাল্লা পরা সমস্ত মেকি সমাজতন্ত্রীদের নক্শা খুলে দেবে। কারণ, এর মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবের বীজ। বিপ্লবের নামে যে সব পার্টি বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে, কোন পার্টিই তার পর্দা খুলতে পারবে না। যে পারবে সে এই পার্টি — এস ইউ সি আই। তাই এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে সব মেকি বিপ্লবী দলগুলির ভিতরে ভিতরে যেন একটা সাধারণ ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে।

অথচ, সকল পার্টিই মনে মনে স্বীকার করে, এই এস ইউ সি আই পার্টির কর্মীরাই সবচেয়ে সৎ। সকল মানুষকে জিজ্ঞেস করলে সকলেই একবাক্যে বলবেন, এরা সৎ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, 'ডেডিকেটেড'। অন্যান্য পার্টির অনেক কর্মীদের মতো এরা অশালীন উক্তি করে না। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে না। অশালীন, অভদ্র আচরণ করে না। এরা আত্মত্যাগী। অথচ, এই পার্টিটার বিরুদ্ধে সকলে একজোট। এর মানে কী? মানে সকলেই দেখছে যে, তাদের মৃত্যুবাণ এর মধ্যে। কংগ্রেস দেখছে, তার মৃত্যুবাণ এইখানে। সি পি আই দেখছে, তার মৃত্যুবাণ এইখানে। সি পি আই (এম) দেখছে, তার মৃত্যুবাণ এইখানে। ফলে, তারা এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে একজোট হচ্ছে। কারণ, তারা তো রাজনীতির নামে কিছু করে খাচ্ছে। তাদের নিজেদের পরস্পর লড়ালড়িটা তো নকল যুদ্ধ। যেমন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়, ওপরতলার হিন্দু-মুসলমান জমিদাররা, নেতারা একত্রে খানা খায়, মুলাকাত করে, আর গরিব সাধারণ হিন্দু-মুসলমান তাদের উস্কানিতে নিচে পরস্পর ছুরি চালায়। তেমনি তাঁদের নকল লড়ালড়িতে নিচের কর্মীরা যখন মরে, তখন তাঁরা তলে তলে সিদ্ধার্থবাবুর বাড়িতে ডিনার খান। শোনা যায়, তাঁদের পরস্পর মুলাকাতের জন্য স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ি আছে। যদি সেই বাড়িটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জীর বাড়ি আছে — সেখানে মুলাকাত হবে, খানা হবে। তাঁদের অভাব কী? কিন্তু, তাঁরা দেখছেন, এস ইউ সি আই-এর শক্তি যদি বাড়ে, তাহলে সকলে মিলেই একেবারে নিপাত যাবে। তাই সকলে মিলে এস ইউ সি আই-কে কোণঠাসা করতে চাইছেন। আর, করতে চাইছেন একটা বাজে কারণ দেখিয়ে, যা কোনদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটেনি। তাঁরা দাবি করেছেন, ঐক্যফ্রন্টের কোন শরিক দল অন্য শরিকদের ভ্রান্ত রাজনীতির তেমন ধরনের কোন সমালোচনা করতে পারবে না, যাতে তাদের অসুবিধা হতে পারে। তাহলেই নাকি তা 'হোস্টাইল ক্রিটিসিজম' (বৈরীভাবপ্রসূত সমালোচনা)-এর পর্যায়ে পড়ে। আমরা কোনমতেই এ জিনিস মেনে নিতে পারি না। আর, এ জন্যই তাঁরা আমাদের নয়পার্টি ঐক্য জোট থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করলেন।

অথচ দেখুন, যে কংগ্রেস এত বড় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে, তার মধ্যে মডারেটরা ছিল, চরমপন্থীরা ছিল, সন্ত্রাসবাদীরা ছিল, কমিউনিস্টরা ছিল, 'কন্‌স্টিটিউশনালিস্ট'-রা ছিল, কংগ্রেস-সোস্যালিস্টরা ছিল, গান্ধীবাদীরা ছিল — সব ছিল। পার্টিগত প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও কংগ্রেসের মধ্যেই সকলে ছিল এবং গান্ধীজি ছিলেন সেই কংগ্রেসের সর্ববাদীসম্মত নেতা। গোটা দেশের সামনে যেমন নেতৃত্বে গান্ধীজি এসেছিলেন, জ্যোতিবাবু তো তেমন নেতা এখনও হননি। সেই গান্ধীজিকে এ আই সি সি'র প্রতিনিধি অধিবেশনে প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি উঠে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কী তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে। করাচি এবং লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজি যখন 'অহিংসা'কে কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে বললেন — এর আগে পর্যন্ত 'অহিংসা' কংগ্রেসের একটা কৌশল হিসাবে পরিগণিত ছিল — তাঁর সেই প্রস্তাবে বাধা দিয়েছিলেন কে? বাধা দিয়েছিলেন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাট মতিলাল নেহেরু। তিনি বলেছিলেন, অসম্ভব, এ মানা যায় না। নিরস্ত্র ভারতবাসী সংগ্রামের কৌশল হিসাবে গান্ধীজির অহিংসা নীতি মেনে নিতে পারে, কিন্তু তার আদর্শ কোনদিনই অহিংসা হতে পারে না। মতিলাল নেহেরু এই ভাষায় বলেছিলেন, আজও আমার যতটুকু মনে আছে, "আমার হাতে যদি তলোয়ার থাকত, তাহলে আমি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে লড়তাম।" তিনি বলেছিলেন, "অহিংসা কোনমতেই কংগ্রেসের 'ক্রিড' হতে পারে না।" গান্ধীজি কেঁদেছেন। কিন্তু তবুও সেই দুটো সম্মেলনে অহিংসাকে কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করাতে পারেননি।

এই যে পরস্পর সমালোচনা, এই যে পরস্পর পরস্পরের রাজনীতির ভ্রান্ত দিক ধরানো — এ তো কংগ্রেসের মধ্যেও ছিল। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে কমিউনিস্টরা কী তীব্র ভাষায় সোস্যালিস্টদের সেই সময়ে সমালোচনা করেছেন। গান্ধীজি নিজে সন্ত্রাসবাদীদের[৫] কী তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন, এমনকী তাঁদের দেশের শত্রু বলে অভিহিত করেছেন — যার ওপর দেশবন্ধু সি আর দাশের বাড়িতে শরৎচন্দ্র গান্ধীজিকে চেপে ধরেছিলেন। তিনি গান্ধীজিকে তাঁর এই উক্তি প্রত্যাহার করতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে যুক্তিতে গান্ধীজি সন্ত্রাসবাদীদের দেশের শত্রু বলছেন, সেই একই যুক্তিতে মতপার্থক্যের জন্য তাঁরাও তো তাঁকে দেশের শত্রু বলতে পারেন। তাহলে এই পরস্পর বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ঐক্য থাকেনি ? স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেনি ? কংগ্রেসের ঐক্য কি এর জন্য ভেঙে গিয়েছিল নাকি ?

যাঁদের এতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি রয়েছে, তাঁরা লেনিনের বই পড়লেই তো দেখতে পাবেন, 'সোভিয়েট'গুলোতে

মেনশেভিকরা, সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিরা, বলশেভিকরা একত্রে সংগ্রাম পরিচালনা করার সময়েও তিনি পাতার পর পাতা মেনশেভিকদের ওপর, সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারিদের ওপর কী তীব্র ভাষায় চাবুক চালিয়েছেন। আবার, একই সঙ্গে সোভিয়েট-এর মধ্যে থেকে জারের বিরুদ্ধে এবং কেরেন্স্কি সরকারের বিরুদ্ধে একত্রে সাধারণ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচিতে সংগ্রামও করেছেন। কেউ কি তখন জ্যোতিবাবুদের মতো এবং মাখনবাবুদের মতো একথা বলেছে যে, সার্বিক ঐক্যে পরস্পর সমালোচনা চলে না ? একথা তারাই বলে, যারা রাজনৈতিক আন্দোলনে সঠিক রাজনৈতিক লাইন, মতবাদ ও সঠিক রাস্তা নির্ণয় করতে চায় না। যারা বহাল তবিয়তে নেতৃত্বে থেকে বিনা সমালোচনায় যে কোন ভুল রাজনীতিতে জনতাকে নিয়ে যেতে চায় — একথা একমাত্র তারাই বলতে পারে। জ্যোতিবাবুরা চাইছেন, তাঁদের রাজনীতি যত ভ্রান্তই হোক, এমনভাবে তাঁদের সমালোচনা করা চলবে না, যাতে তাঁরা অসুবিধায় পড়েন। অর্থাৎ তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, ততটুকু সমালোচনাই তাঁদের করা চলবে, যাতে তাঁদের কোন অসুবিধা না হয় এবং তাঁদের রাজনীতির ভ্রান্ত দিকটি ধরা না পড়ে। তাহলে, যে সমালোচনায় তাঁদের রাজনীতির ভ্রান্ত দিকটি জনসাধারণ এবং তাঁদের দলের কর্মী ও সমর্থকদের চোখে ধরা পড়ে না, তেমন সমালোচনার মানে কী ? সে সমালোচনা তো লোকদেখানো সমালোচনা। অথচ এই 'সমালোচনা চলবে না' শর্তটি আরোপ করে তাঁরা আমাদের নয় পার্টি জোট থেকে কার্যত বেরিয়ে আসতে বাধ্য করলেন।

নয় পার্টি জোট থেকে এইভাবে বেরিয়ে আসার পর আমরা একটা বই লিখলাম। তাতে ঐক্যের মধ্যেও যে সংগ্রাম রয়েছে — এই বিষয়টি নানান দিক থেকে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের নানা ইতিহাস থেকে তাঁদের সামনে, জনসাধারণের সামনে আমরা তুলে ধরলাম এবং বলশেভিক আন্দোলনের ইতিহাসে ঐক্যের মধ্যেও পরস্পর তীব্র সমালোচনার নজিরটি স্ট্যালিনের উক্তি তুলে দিয়ে দেখালাম যে, জ্যোতিবাবু তাঁর দলের পলিটব্যুরোর সদস্য হয়ে এ সম্পর্কে কী খোকার মতো যুক্তি করছেন। স্বভাবতই তাঁদের দলের মধ্যে যেসব সৎ কর্মী রয়েছে, যারা আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, ঐ দলটাই বিপ্লব করবে, তারা দলের মধ্যে নেতাদের চেপে ধরল। তখন তাঁরা লিখতে শুরু করলেন যে, এস ইউ সি আই নিজেই ঐক্য ভেঙে চলে গিয়েছে এবং নানা অজুহাতে তারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে থাকছে না। এই প্রচারটা তাঁরা এমনভাবে চালাচ্ছেন, যেন আমরা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নেই। কিন্তু, আমরা তো চিরদিন প্রোগ্রামের ভিত্তিতে, আচরণবিধির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন চেয়েছি এবং আজও চাইছি। আমরা চাইছি, তাঁরা আমাদের সাথে বসুন। কিন্তু, তাঁরা আমাদের সাথে বসবেন না। তাঁদের প্রফুল্ল সেনের সাথে বসতে জাত যায় না, এস ইউ সি আই-র সঙ্গে বসতে জাত যায়। তাঁরা 'সিভিল লিবার্টি'র (গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার) আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এস ইউ সি আই-কে সংগ্রামী শক্তি বলে মনে করেন না। তাঁদের কাছে এখন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলার শক্তি হয়েছেন প্রফুল্ল সেন। ভাল। এই রাস্তায় যদি তাঁরা বিপ্লব করতে পারেন, তাঁরা করুন। আমরা পাল্টা রাস্তায় চলেছি।

প্রফুল্লবাবুদের নবনির্মাণ সমিতির সঙ্গে মিলে জয়প্রকাশবাবুকে নিয়ে ৫ই জুনের মিছিল অনুষ্ঠিত করার পিছনে অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে তাঁদের এটাও একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, ৫ই জুনের মিছিলে পশ্চিমবাংলার মানুষ যখন আসবে, তখন হয় এস ইউ সি আই-কে সেখানে আসতে হবে, না হলে এস ইউ সি আই জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, একদম কোণঠাসা হয়ে যাবে। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন, সেই অবস্থায় একদিকে কংগ্রেস এস ইউ সি আই-কে পেটাবে আর অন্যদিকে তাঁরাও দেখে নেবেন। তারপর নির্বাচন তো আসছেই, তখন এস ইউ সি আই-কে তাঁরা ভাল করে দেখে নেবেন। কিন্তু, এস ইউ সি আই-এর চরিত্র তাঁরা বুঝতে পারেননি। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, এটা নির্বাচনী দল নয়। গণআন্দোলন চলতে চলতে নির্বাচন এসে গেলে এই দল নির্বাচন লড়ে ঠিকই। কিন্তু নির্বাচনে হারলে এই দলটা ভাঙে না, নির্বাচনে হেরে দলটা বাড়ে। এই দলের কর্মীরা তৈরি হয়েই আছে যে, নির্বাচন যখন লড়বে, তখন লড়বে বাঘের মতন — কিন্তু, হারবার জন্য তৈরি হয়েই লড়বে। নির্বাচনের কী ভয় তাঁরা এই দলকে দেখাচ্ছেন যে, তার জন্য মূল রাজনীতি এই দল ছেড়ে দেবে ? কিন্তু, তাঁদের এই দাবা খেলাটাও খুব জুৎসই হ'ল না। এখন তাঁরা হয়ত ভাবছেন যে, এই শিবদাস ঘোষই হচ্ছে দুষ্ট শক্তি ! শিবদাস ঘোষ জে পি-কে বুঝিয়ে কী যে করলেন, কী মন্ত্রই তাঁকে দিলেন যে, জে পি বলছেন, তিনি এস ইউ সি আই-এর প্রোগ্রামে যাবেন। এস ইউ সি আই-কে এত চেষ্টা করেও বিচ্ছিন্ন করা গেল না। তাঁরা, সারা ভারতের ঝানু নেতারা, যেখানে বুঝিয়ে কিছু করতে পারলেন না, সেখানে

শিবদাস ঘোষের কথায় এস ইউ সি আই-এর যুব সম্মেলন, তাও আবার ধেধ্ধেরে গোবিন্দপুর, অখ্যাত এক শহর সিউড়িতে গিয়ে জে পি হাজির হলেন। এত গরজ তাঁর !

জে পি সিউড়িতে এস ইউ সি আই-এর যুব সম্মেলনে আসার প্রস্তাবে রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব দলের নেতারা দেখলেন মহা বিপদ। এস ইউ সি আই-এর বর্তমানে জনসভা করার শক্তি ও ক্ষমতা কী, তা তাঁরা জানেন। কাগজপত্রে গত ২৪শে এপ্রিলের সভার কোন পাবলিসিটি না দিলেও সেই সভা দেখে তাঁদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। তাঁরা ভাবলেন, তাঁরা এতগুলো পার্টি মিলে কাগজের পাবলিসিটি নিয়ে এবং এতসব হৈ চৈ করে যে মিছিল করলেন, এস ইউ সি আই একা এই বর্ষাবাদলের দিনেও সিউড়ির মতো একটা জেলা শহরে যদি তাঁদের চেয়ে বড় মিটিং করে ফেলে, তাহলে তাঁদের নাক-কান কাটা যাবে। কাজেই তাঁরা ঠিক করলেন, ধর্মঘটের তারিখ ২০শে জুন-এ নিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এস ইউ সি আই-এর সভায় অসুবিধা সৃষ্টি করতে হবে — যেমন করে হোক বাধা দিতে হবে। তাঁরা ভেবেছিলেন, এইভাবে একদিকে ধর্মঘট ডেকে তাঁরা নিজেরা অসুবিধা সৃষ্টি করবেন, অন্যদিকে কংগ্রেস এবং সরকারি প্রশাসন তো রয়েছেই।

এই সরকারি প্রশাসনের কৌশল হচ্ছে, জে পি যেখানেই যাবেন, সেখানেই বাইরে জে পি'র জন্য তাঁরা যে অনেক কিছু করছেন, এমন ভাব দেখাবেন। অথচ, কার্যকরী কিছুই করবেন না। উলটে সরকারি প্রশাসন এখানে জে পি'র ব্যাপারে অনেক অশোভন আচরণ করেছে। সরকারি সার্কিট হাউসে কত বাজে লোক এসে থাকে। অথচ যে জে পি একজন ভি আই পি'র চাইতে কোন অংশেই গৌণ নন, তাঁর জন্য সার্কিট হাউস তারা দিল না। জনসভার জন্য চাঁদমারি ময়দানের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তা-ও তারা দিল না। সরকারি কর্তারা বললেন, চাঁদমারি ময়দান সরকারি কাজ ছাড়া নাকি তাঁরা দেন না। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বলেছিলেন যে, সরকারি কাজ ছাড়াও চাঁদমারি ময়দান তাঁরা এর আগে অন্যদের দিয়েছেন — যেমন কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারকার্যে ইন্দিরাজির সভার জন্য চাঁদমারি ময়দান তাঁরা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারটা তো আর সরকারি কাজ নয়। ফলে, কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের জন্য ইন্দিরাজিকে ভি আই পি অর্থে যদি চাঁদমারি ময়দান তাঁরা দিয়ে থাকেন, তাহলে জে পি-ও তো তাঁর মতোই একজন ভি আই পি, তাঁর জন্য চাঁদমারি ময়দান কেন দেবেন না ? তখন স্থানীয় সরকারি কর্তাব্যক্তিরা বললেন যে, এটা নাকি রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ব্যাপার। রাইটার্সে আবেদন করা হ'ল, রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বলা হ'ল যে — না, ওটা জেলা প্রশাসনের ব্যাপার। এইসব করে চাঁদমারি ময়দান পাওয়া গেল না। তারপর এই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। প্রতিনিধিদের একটা অংশের থাকার জন্য বাড়ি নেওয়া হ'ল। হঠাৎ পুলিশ গিয়ে সেই বাড়ির মালিককে বলল যে, সেই বাড়িতে তাদের থাকতে দিতে হবে। ফলে, সেই বাড়িও পাওয়া গেল না। এইভাবে সমস্ত দিক থেকে এই সম্মেলনের ব্যাপারে সরকারি প্রশাসন বাধা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে আট পার্টি ২০শে জুন সাধারণ ধর্মঘট ডেকে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি তো করেছেই। কিন্তু এত করেও তার ফল কী হয়েছে ? মানুষকে তারা আটকাতে পেরেছে নাকি ?

তারা এটা জানে না এবং বিভিন্ন দেশের বিপ্লব থেকে এই শিক্ষা নেয়নি যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমর্থকবৃন্দ — কংগ্রেস সহ — সবাই মিলে মোট যে জনসংখ্যা, তার চাইতে তার বাইরে যে বিপুল জনসাধারণ রয়েছে, তা অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ। সকল পার্টিগুলোর সংগঠনের শক্তি একসঙ্গে জড়ো করলেও যে জনতা হয়, তার বাইরে যে জনসমুদ্র তা সব সময় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে — বিপ্লবের আগেও থাকে, বিপ্লবের পরেও দীর্ঘদিন থাকে। বিপ্লবী দলকে সবসময় এই বিপুল জনশক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। আমাদের পার্টির নেতৃত্ব এই জায়গাটায় ভুল কখনও করেনি। তারা জানে, পশ্চিমবাংলার জনমানস কী চায়। পশ্চিমবাংলার মানুষ ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। তারা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী আন্দোলন চাইছে। কিন্তু সাথে সাথে তারা রাজনীতিতে ভদ্রতা চায়, শৃঙ্খলা চায়, বিনয় চায়, ত্যাগ চায় এবং তেমন ধরনের রাজনৈতিক কর্মী চায়। তারা রাজনীতিতে দাপট চায় না, গুন্ডামি চায় না, অশালীনতা চায় না। আমাদের পার্টির নেতৃত্ব দলের কর্মীদের সেইভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছে।

আমি অসুস্থ, হাঁপিয়ে উঠেছি। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর বেশি আপনাদের কাছে বলতে পারব না। বাকিটা আপনাদের নেতারা আপনাদের বুঝিয়ে দেবেন। তাঁরা আপনাদের বুঝিয়ে দেবেন, কী আপনাদের কর্মপদ্ধতি হবে এবং কীভাবে এলাকায়-এলাকায়, মহল্লায়-মহল্লায় ছাত্র-যুবদের আপনারা ডাকবেন। আপনারা সেই সব বৈঠকে নেতাদের নিয়ে যাবেন এবং যেসব ছাত্র-যুবরা দায়িত্ব নিতে রাজি হবে, তাদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তুলবেন। এই সংগ্রাম কমিটিগুলি যথার্থ কাজের কমিটি হবে, ফাঁকিবাজির কমিটি হবে না।

যেখানে সকলকে বর্তমান পরিস্থিতি ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বলতে হবে যে, একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে — তার মোকাবিলা করার জন্য সকলকে দায়িত্ব আপন হাতে নিতে হবে। সি পি আই (এম)-এর ওপর ওপর কংগ্রেস বিরোধিতা, আর তলে তলে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচনে দাঁড়ানোর দুষ্ট রাজনীতিটিকে ধরিয়ে দিয়ে বলতে হবে — এই নক্‌শার বিরুদ্ধে জনশক্তিকে উঠে দাঁড়াতে হবে। সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে গণসংগ্রামগুলি পরিচালনা করতে হবে। এই লড়াইয়ের মধ্যেই যদি নির্বাচন আসে, জনশক্তির ওপর ভিত্তি করেই তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। তেমন ভাবে গ্রাম স্তর থেকে শহর পর্যন্ত সংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তোলা দরকার। এই বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। সি পি আই (এম) পরিচালিত আট পার্টির জোট

২। ১৯৭৫ সাল

৩। আমেরিকার তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট

৪। 'অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনে'র পূর্ববর্তী নাম

৫। তখন সন্ত্রাসবাদী বলতে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদেরই বোঝানো হত। বর্তমানে এই শব্দটির অপব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২১ জুন ১৯৭৫ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৫ সালের ২৪ জুন
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।